এক টাকায় স্মৃতি পাঠাগার

আবদুল হালিম খান

একাত্তরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরেছি। টগবগে যৌবন, হৃদয়ে দেশ পুনর্গঠনের হাজারো পরিকল্পনা। যেহেতু আমরা ছাত্র-সংগঠনের সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, তাই প্রথম পর্যায়ে এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছাত্র-সংগঠন তথা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের শাখা গঠন করি। আমাকে সভাপতি ও আমার সহপাঠী ও সহযোদ্ধা হারুন-অর-রশিদ বাচ্চুকে সাধারণ সম্পাদক করে তেইশ সদস্য বিশিষ্ট শ্রীনগর, সিরাজদিখান ও নবাবগঞ্জ থানা আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়।

সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চুড়াইন বাজারে দৃষ্টিনন্দন একটি টিনের দোতলার উপরতলায় দুটি সুপরিসর কক্ষ নিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের অফিস করা হয়। একই সঙ্গে বাড়ৈখালী বাজারেও অনুরূপ একটি অফিস করা হয়। চুড়াইন বাজারের অফিসটির সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করত চুড়াইনের পরিতোষ দাস। আমরা নিয়মিত সেই অফিসে বসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কাজ করতাম। প্রথম পর্যায়ে আশু-কর্মসূচি হিসেবে চারটি কর্মসূচি হাতে নিই–

১. এলাকার বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট মেরামত করা;
২. কৃষকদের সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করা;
৩. অগভীর নলকূপ বসিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা;
৪. সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ছাত্র ইউনিয়নের পাশাপাশি আমাদের এলাকায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ কৃষক সমিতির শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো পূর্বোক্ত সংগঠনগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে পালন করেছি। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে সমগ্র বাংলাদেশে 'স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড' গঠন করা হয়। আমাদের এলাকায়ও শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড গঠন করেছিলাম। এই ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন আজকের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ইউনিক গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ নূর আলী।

ওই বছরের রোজার ঈদের দুদিন আগে অফিসে বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। হঠাৎ মাথায় এল আমাদের অফিসের পাশের কক্ষটিতে একটি পাঠাগার করলে কেমন হয়। সবাই একবাক্যে সমর্থন করলেন। তবে পাঠাগার করতে তো টাকার প্রয়োজন। টাকা পাওয়া যাবে কোথায়? অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বলে ফেললাম, 'টাকা আমি দেব। কিন্তু শর্ত হলো, আমি যা বলব তা তোমাদের করতে হবে।' এই শর্ত সবাই মেনে নিল। বললাম,

'আগামীকাল এই সময়ে তোমরা অফিসে আসবে, আমি তোমাদের নির্দেশনা দেব।'

রাতভর চিন্তা করলাম কীভাবে পাঠাগারের টাকা সংগ্রহ করা যায়। আমরা তো ছাত্র, আমাদের পক্ষে টাকা দেওয়া মোটেও সম্ভব নয়। কারো কাছে চাইব এমন মানুষও খুঁজে পাচ্ছি না। তাছাড়া ঐ সময়ের বাস্তবতায় একজন ব্যক্তির পক্ষে একটা পাঠাগার গড়ার টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। এবারও মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ঠিক করলাম আমরা যদি এক টাকা করে অনুদান চেয়ে মানুষের কাছে যাই এবং এক হাজার লোকের কাছে যেতে পারি, তাহলে তো টাকার সমস্যা মিটে যায়। পাশাপাশি এক হাজার লোককে পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় সম্পৃক্ত করতে পারি।

পরদিন ছাত্র ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে কর্মীদের বললাম, 'আমি ঢাকা যাচ্ছি, আগামীকাল ফিরব। আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় বিভিন্ন গ্রামের পঁয়ত্রিশ জন বাছাই করা কর্মী নিয়ে তোমরা অফিসে উপস্থিত থাকবে।'

ঢাকায় গিয়ে সূত্রাপুর এলাকার চব্বিশ শ্রীস দাস লেনের পপুলার প্রেস থেকে এক টাকা মুল্যের এক হাজার কুপন ছাপিয়ে পঁচিশ পাতা করে চল্লিশটি বই তৈরি করলাম। পরদিন ঢাকা থেকে সরাসরি অফিসে গেলাম। গিয়ে দেখি নূর আলীর নেতৃত্বে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেডের কর্মীবাহিনী প্রস্তুত। দিনটি ছিল রোজার ঈদের আগের দিন। প্রত্যেক কর্মীর হাতে পঁচিশ পাতার একটি বই দিয়ে বললাম, 'আগামীকাল ঈদের নামাজের পর যার যার গ্রামের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকদের কাছ থেকে কুপনের মাধ্যমে এক টাকা করে সংগ্রহ করবে।' আমি নিজে পাঁচটি বই রাখলাম। সবাইকে বললাম, ঈদের দিন বিকেলে সংগৃহীত টাকাসহ আবার অফিসে আসতে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো পঁচিশটি কুপন দিয়ে টাকা তুলতে কোনো কর্মীরই আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে নি। যার কাছে চেয়েছে সে-ই সন্তুষ্টচিত্তে দিয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, টাকা হিসেব করে দেখা গেল মোট এগারোশ' টাকা সংগ্রহ হয়েছে। কুপন দিলাম এক হাজার টাকার, এগারোশ' টাকা সংগ্রহ হলো কী করে? খবর নিয়ে জানা গেল, এক টাকার বদলে কেউ কেউ দুই টাকা, পাঁচ টাকা এমনকি দশ টাকাও দিয়েছেন।

এত অল্প সময়ে সফলভাবে টাকা সংগ্রহ হওয়ায় সবাই খুব আনন্দ পেল এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। ঈদের কয়েক দিন পরে বাংলা একাডেমি থেকে আমরা বেশ কিছু বই কিনি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ন্যাপ-নেতা প্রয়াত অ্যাডভোকেট জাকির আহম্মেদ, যিনি পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন, তিনি একাই তিনশ টাকার বই কিনে দিলেন। প্রচুর পরিমাণ বই নিয়ে যখন অফিসে ফিরলাম, সবার সে কী আনন্দ। বই কেনার সময়ে আমার সঙ্গে ঢাকায় আসে ছাত্র ইউনিয়নকর্মী হাফিজুর রহমান।

এবার এল নামকরণের পালা। ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ নেতা–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, লৌহজং উপজেলার কাজির পাগলা গ্রামের পুলিশ অফিসারের জ্যেষ্ঠ সন্তান জাহাঙ্গীর মুনির ও শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর গ্রামের কৃতিব্যক্তি রাষ্ট্রদূত কামরুদ্দিনের মেধাবী ছেলে নিজামুদ্দিন আজাদের নামে পাঠাগারের নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এঁরা দুজনই ভারত থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণশেষে দেশে ফেরার পথে কুমিল্লার বেতিয়ারায় পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হন।

আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে কয়েকশ বই ছিল, আলমারিসহ সবগুলো বই পাঠাগারে দিয়ে দিলাম। সব মিলিয়ে একটা সমৃদ্ধ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলো। পাঠাগারটি উদ্বোধন করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত। পাঠাগারটি ভালোই চলছিল। তবে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর বৈরী পরিবেশে আমরা অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে আসি। পাঠাগারটি অরক্ষিত হয়ে যায়, অনেক বই খোয়া যায়। কালক্রমে পাঠাগারটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বই পড়ার আনন্দ মনের চাহিদার কতটুকু পুরণ করে অথবা মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় কোনো বিশেষ ভূমিকা রাখে কি না–এ বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ কী আমি জানি না, তবে এই কথা জোর দিয়েই বলতে পারি, সেদিনের এক টাকার মান ও ওজনে তারুণ্য-প্রফুল্ল চিত্তে যে-পাঠাগার তৈরির সিদ্ধান্ত ছিল, একই অনুপ্রেরণায় সেটি আজ অর্ধ-শতাব্দী পরে হলেও সম্ভব। জনপ্রতি শুধু একশত টাকা ধরে এইরকম স্মৃতি-পাঠাগার অবলীলায় গড়ে তোলা যায় মনচৈতন্যের সরল বিকাশের লক্ষ্যে। আজ সেই আহ্বান জানাই, পঠন-বিলাসিতা হোক আমাদের নিত্য কর্তব্যের অংশ।

আমাদের প্রজন্মের মানসিক বিকাশ এবং পাঠাগার আন্দোলন প্রসঙ্গ:

মার্জিয়া লিপি

আজকাল শিশুরা বেড়ে উঠছে আমাদের স্বপ্নের বোঝা কাঁধে নিয়ে। দিগন্তজোড়া সবুজ খেতের আঁকাবাঁকা পথ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফড়িং কিংবা প্রজাপতির দিকে ছুটতে থাকা এখনকার শহুরে শিশুদের নাগালের বাইরে। ডাংগুলি-মার্বেল-গুলতি-গোল্লাছুট খেলা, কাদামাটি দিয়ে শখের নকশা বানানো, সন্ধ্যায় ডোবার পাশে সবুজ ঝোপঝাড়ে জোনাকি ধরতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। নদী-বিল-ঝিলে সাঁতার কেটে লাল-সাদা-বেগুনি শাপলা তুলে আনা; শালুক আর পানিফল খুঁজে পাওয়া; কিংবা ঘুড়ির ভোকাট্টায় নিজেদের স্বপ্নগুলো আকাশে উড়িয়ে দেওয়া–এই সবকিছুই তাদের কাছে অধরা স্বপ্ন।

পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত শহুরে মা-বাবারা নিজেদের জীবনের অধরা স্বপ্নের ভার অবলীলায় শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মতো অন্যায় করছি। নাগরিক-জীবনে শিশুদের রয়েছে নানা রকমের সীমাবদ্ধতা। শহুরে যান্ত্রিকতায় আজকাল তাদের অভ্যস্ত করছি অনেকটা জোর করেই। কোমলপ্রাণ শিশু-কিশোরদের মাপছি নিজেদের শখের বাটখারার যান্ত্রিকতায়। অনেক ক্ষেত্রে রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রণ করছি তাদের ইচ্ছা, আবদারকে। ঘরের কোনে আবদ্ধ রেখে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরায়। স্যাটেলাইটের কল্যাণে বিভিন্ন কার্টুন চ্যানেলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ভিনদেশি ভাষায়, ভিনদেশীয় সংস্কৃতিকে। আকাশ-সংস্কৃতি আর যান্ত্রিক ইন্টারনেটের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে নাগরিক জীবনপ্রবাহ–যা শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায়। আমরা অভিভাবকরাও বুঝে, না-বুঝে কিংবা বাধ্য হয়ে আধুনিকতার নামে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কুপ্রভাব পড়ে এমন প্রযুক্তি হাতে তুলে দিয়েছি। শিশু-কিশোরেরা খেলাধুলায় অভ্যস্ত না হয়ে এখন মোবাইল ফোনে বিভিন্ন গেমসহ নানা ধরনের আসক্তিমূলক সফটওয়্যার ব্যবহার করছে–যা তাদের ওপর ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

যদিও বাস্তবতা–বর্তমান সময়ে একটি অপরিহার্য ইলকেট্রনিকস যন্ত্র–মোবাইল ফোন। এর মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্মার্টফোন অপরিহার্য একটি ডিভাইস। কথা বলার পাশাপাশি স্মার্টফোনে ইন্টারনেট গ্রহণের সুবিধা রয়েছে। একটা সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের একমাত্র উপায় ছিল কম্পিউটার। বর্তমান সময়ে স্মার্টফোনে কম্পিউটারের সকল কাজই করা সম্ভব। মোবাইল ফোন ব্যবহারের রয়েছে বহুবিধ উপকারী দিক এবং সুবিধা। আবার অপকারিতার সংখ্যাও কম নয়। যেসব জিনিসের উপকারিতা রয়েছে, তার কিছু অপকারিতাও থাকে–এটাই স্বাভাবিক।

কোভিড-১৯-এর কারণে মহামারীর সময় থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন সংযোজিত হয়েছে–'অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম'। এটি যেমন শিক্ষাকার্যক্রম অথবা যোগাযোগের মাধ্যম, তেমনই একটি বিনোদনেরও মাধ্যম। মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তিতে বিভিন্ন বয়সী প্রজন্ম পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, বাড়ির কাজ করার সময়ে এবং এমনকি স্কুলের পাঠের